অশ্বমেধের ঘোড়া : স্মৃতিবিস্মৃতির চেয়ে কিছু বেশি

হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

ওরা কাঞ্চন-রেখা। ওদের চোখের সামনে ঘোড়াটা ছুটছে।

তথাকথিত উন্নতি আর প্রগতির অশ্বমেধের ঘোড়া। বিজিত জনপদের মতো পায়ের তলায় মাড়িয়ে যাচ্ছে সূক্ষ্মতা আর সংবেদন, হারিয়ে যাচ্ছে মুগ্ধতা আর অভিমান। নাগরিক সাফল্যের কুহক যেন দুচোখে ঠুলি হয়ে আছে। দিগ্বিজয়ের উল্লসিত হ্রেষায়, তার তুখোড় গতির পরাক্রমে, হর্ষের হর্সপাওয়ার দীপ্তিতে পুরনো সহজ মানবিক সেন্টিমেন্টগুলি ছিটকে পিছু হটে গেছে কবে! ছুটছে অশ্বমেধের ঘোড়া। সময়-সমাজ-স্বভাবের মিলিত বর্ণময় কোলাজ তার শরীরে।

যেন কাচের পৃথিবীর পিচ্ছিল পাটাতনে দাঁড়িয়ে একজন কাঞ্চন দেখছে এইসব, আর ভাবছে, "এই কলকাতা দিন দিন আধুনিক হচ্ছে, বর্বর হচ্ছে, সূক্ষ্মতার নামে দরকচা মেরে যাচ্ছে।" ত্রিমাত্রিক তঞ্চকতার এমন এক বিশ্বে দাঁড়িয়ে একজন রেখা দেখেছে এইসব, আর বলছে, "এত বাণী দিও না মাস্টার মশাই। লোকে ধরে বেঁধে মন্ত্রী বানিয়ে দেবে।" এদের দ্যাখা আর এদের অনুভব-অভিমানটুকু দ্যাখানোর দায়ভার যেন সেধে নিয়েছিলেন দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর অসামান্য গল্প 'অশ্বমেধের ঘোড়া'-র অক্ষরে অক্ষরে। কাঞ্চন এবং রেখা সেই গল্পের দুই কেন্দ্রীয় চরিত্র।

জীবনের গল্পগুলিতে সাধারণত যেমন হয়, প্রথমে ওদের বন্ধুত্ব, তারপর প্রেম। তারপর চুপিচুপি বিয়ে। রেজিস্ট্রি। গোপন গেরিলাযুদ্ধের মতো এই বিয়ের শরিকও দুচারজনই মাত্র, সুকুমার, প্রফুল্ল, চন্দন। কারণ বাড়ি মানেনি, সমাজও সম্ভবত না। সইসাবুদ-শেষে প্রতীকী মালাবদলের মালা হাতে চূড়ান্ত অপ্রস্তুত যুগলে বাঘমার্কা ডাবলডেকারে উঠে এবং আর এক প্রস্থ অপ্রস্তুত অবস্থায় নেমে বাস কন্ডাকটারের টিটকিরি শুনতে শুনতে ঠিক যে কলকাতার রাজপথে এসে দাঁড়িয়েছিল, সেই পথ যেন তাদের হয়েও তাদের নয়। সানাইয়ের সুর, কান্নার স্বাদ আর অসম্মানের গন্ধমাখা সেই রাজপথে মাঙ্গলিক মালাজোড়া অভিমানে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ওরা দেখেছিল, "একটা স্থবির বলদ সেটি চিবুচ্ছে।"

ওরা, কাঞ্চন আর রেখা। স্বামী-স্ত্রী। অথচ চারপাশের কেউ জানে না ওদের বিয়ের কথা। কারণ একসাথে থাকে না ওরা, থাকেনি একদিনও। "রেখা রুমাল দিয়ে ঘষে ঘষে কপালের সিঁদুর মুছে" ফেলেছিল সেই রেজিস্ট্রির দিনেই। তারপর থেকে শুধুই ভয়। লুকোচুরি। যেন গোটা পৃথিবীর চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা। এবং তারপরও প্রাপ্য আর প্রাপ্তের ব্যবধানে দাঁড়ানো দুটি স্পর্শকাতর, অতএব স্পষ্ট কাতর নারীপুরুষের পরস্পর সম্পর্ককে আঁকড়ে ধরে বাঁচার বিচিত্র বারোমাস্যা। সাধারণ বাঙালি মধ্যবিত্তের চেয়ে ঢের বেশি সংবেদনশীল আর কল্পনাপ্রবণ হওয়াটাই যেন কাঞ্চনদের ক্ষেত্রে সত্যিকার সমস্যা। যে নির্বোধ হঠকারিতাকে আমরা সাহস বলি, যে বাচাল চাতুরিকে আমরা সপ্রতিভতা বুঝি, যে বৈষয়িক ধূর্ততাকে আমরা প্র্যাকটিক্যাল হওয়া ভাবি—সেই সবের থেকে অনেক দূরে দাঁড়িয়ে এরা দ্যাখে,

সৌন্দর্য আর স্বপ্নের মতো ভেঙে খানখান হয়ে যাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হল, যেন কুৎসিত ক্যাকোফনির মাঝে হারিয়ে যাচ্ছে সানাইয়ের চন্দ্রকোশ। যেন আসলে ভেঙে যাচ্ছে তাদেরই ঘরবাঁধার স্বপ্নটা। আর সেই নষ্টনীড় বেদনাবেলায় গল্পে তাদের শুধু বারবার দ্যাখা যায় পাশাপাশি হেঁটে যেতে, কিংবা বাসে চেপে গোধূলিমদির শহরের অলিগলি ঘুরে আবার যে যার মতন ডেরায় ফিরে যেতে। সুসভ্য প্রেমিকসুলভ এই শোচনীয় অবদমনই অগত্যা তাদের অনন্যোপায় দাম্পত্য। অথবা, তার শতচ্ছিন্ন ছদ্মবেশ। সুতরাং জয় করে তবু ভয় কিছুতেই যায় না। তবু এই ভীরু প্রেমের মেঘাচ্ছন্ন মন্থর আকাশে ধ্রুবতারাটির মতো বেঁচে থাকে তাদের কমিটমেন্ট। ভালোবাসা।

বড্ড বেশি বুদ্ধিজীবী ওরা। একটু বেশিমাত্রায় পোশাকিও যেন। দিনের পর দিন রাতের পর রাত পারস্পরিক ব্যবধানের দীর্ঘশ্বাস পার হয়ে তাদের দ্যাখা হলেও তারা যতোটা আন্তরিক ততোটাই যেন অ-শরীরী। বহুমূল্য মুহূর্তগুলি শুধু কথায় ভরে রাখে তারা, কুণ্ঠিত হাতে হাত রাখা কিংবা পায়ে পায়ে সতর্ক পথচলা বিনা কতোটুকু উষ্ণতা বিনিময় হয় তাদের? লোকলোচন এড়িয়ে, এই সুবিমলদের মতো পরিচিতের অশালীন কৌতূহল এড়িয়ে চলতে চলতে কতোটুকু উষ্ণতা বাঁচিয়ে রাখাই বা সম্ভব? হয়তো কিছু মর্মান্তিক সত্যকে দুজনেই দুজনের কাছে আড়াল করতে চায় এবং চায় বলেই বৃথা এত কথার ইমারত রচা। হয়তো তাই কাঞ্চন কখনো বা বলেই ফ্যালে "জানো, এই কথার খেলা সত্যি আর ভাল লাগে না।" তবু এমন খেলা চলতে থাকে, চলতেই থাকে। আশেপাশে পড়ে থাকে হেলাফেলা সারা বেলা, আশাহত। এমনি করে বিধিবদ্ধ বেঁচে থাকার ফাঁকেই, কী আশ্চর্য, বছর ঘুরে যায়! ফিরে আসে কাঞ্চন আর রেখার প্রথম বিবাহবার্ষিকী। গল্পের মূল সময়াঙ্ক সেই দিনটাই।

ভয়াবহ বাস্তবের প্রহারে পাংশু এরা দুজন ঠিক করেছিল, একটু আলাদাভাবে কাটাবে দিনটা, একটু বেশি যত্নে, একটু বেশি মর্যাদার সঙ্গে। সহজে লজ্জা পাওয়া অথবা সহজে দুঃখ পাওয়ার ভদ্রলোকি অভ্যেস জলাঞ্জলি না দিয়েও একটু বেশি সময় ঘনিষ্ঠ হয়ে তাদের ব্যক্তিগত বড়ো দিনটাকে বাড়তি একটু মূল্য দিতে চাইলো দুইজনে। স্মৃতিকাতর কাঞ্চন পুরনো সেই দিনের মতো আবার যেন সন্ধ্যার বাতাসে শুনতে পেল চন্দ্রকোশ, সঙ্কোচের বিহ্বলতা ছেড়ে রেখা আবার পথের প্রৌঢ় পসারির থেকে কিনে নিলো ফুলমালা। এবং সেই ব্যতিক্রমী শুক্লপক্ষে হঠাৎ যখন কাঞ্চনের "বেশ একটু মোগলাই মেজাজ হচ্ছে" ওরা দুজনে সাব্যস্ত করলো, আজ যে যার ঘরে ফেরার পথটায় আর বাসযাত্রার জনগণতান্ত্রিক নিয়মে অথবা, ট্যাক্সির বেলেল্লা দ্রুতির ডানায় ভর করে ফিরবে না, ফিরবে সময়কে উপভোগ করতে করতে বেশ আয়েস করে, স্মরণযোগ্যভাবে। কার্যত যা হবে, এমন দিনে, দুজনকে দুজনের দেওয়া সেরা উপহার।

আইডিয়াটা কাঞ্চনের! তারা ঘোড়ার গাড়িতে চেপে ফিরবে। যেন বা উনিশশতকী বাবুর মতো, অলৌকিক দুলকি চালে, গতিময় নগরের তাৎপর্যহীন ব্যস্ততাকে করুণা করতে করতে! নিজস্ব নির্জনতায়, স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যতে মেলামেশা রঙিনতম মুহূর্তগুলি নিজেদের মাঝে ভাগ করে নিয়ে। কারণ তারা তো জানেই গোটা বছরভর কিছুই দিতে পারে নি তারা

নিজেদের, অবশিষ্ট পরিচিত পৃথিবীর থেকে পালিয়েছে শুধু, কারণ তারা তো জানেই :

"ভালো লাগে না। ভালো লাগে না। চুরি করে একটু সময় নেওয়া, দুটো কথা, একপেঁয়ালা কফি, লম্পট নদীতীরে নির্জনতার ব্যর্থ আকর্ষণ, তারপর অক্ষম ক্লান্তি ও ক্ষোভে অপরিচিতের মতো ঘরে ফিরে যাওয়া। একদিন কোনও এক নিকট অথচ বিস্তৃত অতীতে, সবই ছিল স্বপ্ন। আর আজ, আর এখন, ঘেন্না করে।"

সুতরাং, আজ, এখন, এই বিশেষ স্মরণের সরণিতে দাঁড়িয়ে, ঘৃণা মুছে, নানান মাত্রার অভাব পাশে সরিয়ে ওরা এই সময়টুকুর সম্রাট হতে চেয়েছে, তাই কাঞ্চন চিৎকার করে ডাকে—'গাড়োয়ান রোককে'। তারপর বিস্মিত রেখার অবাক উপস্থিতি এবং নীরব তারিফকে তারিয়ে তারিয়ে গ্রহণ করতে করতে উঠে বসে ফিটনে। ওরা দুজন, কাঞ্চন আর রেখা। এসপ্ল্যানেড থেকে খিদিরপুর—এই নিত্যযাত্রাপথ আজ একটু অচেনার আবহে বর্ণময় হোক, এই ভেবে। সহিস বলে :

"পোলের ওপারভি যাবেন?

না।

গঙ্গার কিনারা দিয়ে?

হ্যাঁ।

চার টাকা লাগবে স্যার।"

এই হতভাগ্য শহরে, এই বর্তমানে, স্বপ্নেরও দরদস্তুর চলে। কংক্রিটের এই জঙ্গলে সাধ আর সাধ্যের মধ্যে চলে নিয়ত টানাপোড়েন। সেই নৈমিত্তিক দড়ি টানাটানির খেলায় অতিস্পর্শকাতর কাঞ্চন সহজে আহত হয়। তার হীনম্মন্যতা ও ব্যর্থ পৌরুষ কখনো কখনো রেখার প্রতি ক্রোধ হয়ে ঝরে। একসময় অশিষ্ট গাড়োয়ানের সঙ্গেও বার্গেনিং শেষ হয় আড়াইটাকায়। ওরা ঘোড়া-গাড়িতে উঠে বসে। কাঞ্চনের "অদ্ভুত আনন্দ" হয়।

"তারপর গাড়ি চলতে শুরু করল। পরপর কতগুলো বাস বাতাসের ঝাপট দিয়ে চলে গেল। জানলার পাশে দু একজন যাত্রী একটু ঝুঁকে কাঞ্চনদের দেখল।...গাড়িটা দক্ষিণে ঘুরল।... কাঞ্চন এতক্ষণে অনুভব করল চৌরাস্তার ভিড়ে ঘোড়ার গাড়িতে বসে থাকতে সে অত্যন্ত কমপ্লেক্স বোধ করছিল।

আর বৃষ্টি নামল। রেখা বাইরে হাত পেতে ধরল। ফোঁটা ফোঁটা জলে হাতটা অপরূপ হয়ে উঠল। আঙুলগুলিতে একটি মুদ্রার ভঙ্গি। ঘোড়ার ক্ষুরের অলস অথচ অবিচ্ছিন্ন শব্দপ্রবাহে কাঞ্চনের মনে হঠাৎ নূপুরের মৃদু শব্দতরঙ্গের অনুষঙ্গ এল। সারেঙ্গিতে গাঢ় পুরুষালি ছড়ের টানে চন্দ্রকোশ বেজে উঠল।"

এই মন্ত্রমুগ্ধ পরিপার্শ্ব কাঞ্চনের অতিরোমান্টিক অনুভূতির কোণে যে ফাল্গুনী রচনা করে চলেছিল, হঠাৎ তার মগ্নতায় ধাক্কা দিয়ে, সমস্ত সূক্ষ্ম মীড়ের মায়াজালকে নাকচ করে দিয়ে সহসা সহিস হেঁকে বললো :

"বাবু?

কেন?

পর্দাটা ফেলে দিব?

কাঞ্চন জানত না এ জাতীয় ফিটনে পর্দা থাকে। অবাক হয়ে বলল 'দাও'। মুহূর্তে যেটাকে ভেবেছিল গাড়ির ছাউনি, তার ওপর থেকে দুপাশে দুটো চামড়ার পর্দা ঝুলে পড়ল। আর হঠাৎ তারা সমস্ত পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।"

অতএব, পুনর্বার স্তব্ধতা ও বিস্ময়। যে নির্জনতা ও নৈকট্য তাদের ন্যায়সঙ্গত পাওনা ছিল এতোদিন, অথচ যা শহর কলকাতার রকমারি ঔৎসুক্য আর তার হৃদয়হীন নিরেট ব্যস্ততা দ্যায় নি, হঠাৎ তা-ই পেয়ে প্রথম বিবাহবার্ষিকীর অন্তরাতে এসে তারা কিছুটা হতবাক হয়ে গেল। কাঞ্চনের আত্মসমালোচক মন এই অবকাশে অকস্মাৎ জানালো :

"রেখাকে নতুন করে কিছুই জানি নি। রেখার শরীর না, মন না, অভ্যাস না। আসলে আমরা দুজনেই আমাদের আমাদের অনেক আকাঙ্ক্ষা পরস্পরের কাছে গোপন করে যাচ্ছি, নিজের কাছে মহৎ থাকার তাড়নায় পরস্পর ছদ্মবেশ পরেছি।"

যে সুস্থ পারিবারিক জীবন পরস্পরকে চেনার স্বাভাবিক সুযোগটুকু করে দ্যায়, কাঞ্চন-রেখার পক্ষে পরস্পরকে নিবিড়ভাবে চেনাজানার সেই সুযোগ ছিল না। কেন ছিল না, কেন সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে দেবার সৎসাহস 'সাহিত্যের অধ্যাপকের' ছিল না, কেন রেখার অনমনীয় জেদ প্রেমটুকুকে বিমূর্ত আদর্শের মতো আঁকড়ে ধরে থাকলেও তার স্বাদু সাধ, অথবা সাধু স্বাদকে পেতে চাইবে না? না, গল্পে এই জরুরি প্রশ্নের কোনো বুদ্ধিবিবেচনাগ্রাহ্য সদুত্তর নেই। কেন নেই? মন মন, তোমাদের কী শরীর নেই কাঞ্চন-রেখা?

তবু যে তারা ড্রইংরুমের দম দেওয়া সিন্থেটিক পুতুল নয়, চলমান কোনো প্লেটোনিক থিয়োরি নয়, রক্তমাংসের মানুষ, এই ছোট্ট মুহূর্তের একান্ত আড়ালে তার কিছু পরিচয় ধরা ছিল কাঞ্চনের আকাঙ্ক্ষার ভাষায় :

"ছুঁতে ইচ্ছা করছে। খোঁপাটা খুলে একমুঠো ফুলের মত চুলগুলোকে যদি রেখার মুখে বুকে ছড়িয়ে ছড়িয়ে দি? হাতটা ধরব? কান পেতে রেখার হৃৎপিণ্ডের শব্দ যদি শুনতে পেতাম্? আমার রক্ত আমার মন বৃষ্টি হতে চায়।"

কিন্তু দ্বিধাও আছে। পরাজিতের দ্বিধা নয়, বিজয়ীর দ্বিধা, প্রকৃত পুরুষের স্বাভিমান। যে নারী তার নিজস্ব, তার স্ত্রী, তাকে পেতে চাওয়ার এই কাঙালপনা কি কাঞ্চনের সাজে? কোনো মর্যাদাবান প্রেমিকের সাজে? সুতরাং তার মনে হয় :

"আসলে যৌবন আমাদের লজ্জা, আমাদের যন্ত্রণা। আমি পারি না। আমি পারি না এখানে রেখাকে অপমান করতে।"

কাঞ্চন পারে না এই অন্ধকার নির্জনতার সুযোগ নিতে। রেখা পারে না তার ভীষণ ভালোলাগাকে অযথা ভিখারি বানাতে। কারণ তারা তো সত্যি সত্যি ভালোবাসে পরস্পরকে। সময় ছেনতাই করা এই ব্যতিক্রমী সুখটুকুকে তাই গলায় বরণমালা করে পরে নিতে চায় রেখা, সম্পর্কের স্বীকৃতি যেন, আর কিছু নয়, বেয়াদপ আদর না, কারণ কামনাকে লালসায় বদলে নিতে তার, তাদের রুচিতে বাঁধে। যা দামি, তাকে মূল্যহীন করেনি তারা। অথচ সময় আর সড়ক তো থেমে থাকে না। গন্তব্য এসে যায়।

"গাড়িটা দাঁড়িয়ে পড়ল। গাড়োয়ান ডাকল—বাবু?

কী?

খিদিরপুর।"

ফিটন থেকে নামলো ওরা, দুজনে মিলে ভাড়ার আড়াইটাকা গাড়োয়ানের দিকে বাড়িয়ে দিতেই বিপত্তি :

"সে চটে উঠে বলল 'সে কী? পাঁচ টাকার কম হবে না।'

কাঞ্চন ক্রুদ্ধ হয়ে বলল 'কেন? তুমিই তো বলেছিলে।'

গাড়োয়ান বলল, 'ফুর্তি করবেন, হোটেল ভাড়াভি দিবেন না?"

ভাবতে ইচ্ছা করে, ঠিক কি রকম মুখভঙ্গি ছিল তখন এই গাড়োয়ানের, এই কথাগুলো বলার সময়? ঘোলাটে রক্তিম দুচোখে ঠিক কতটা অশ্লীল আশ্লেষ মাখা ছিল? সকলে যে একইরকম হয় না, সব ব্যক্তিমানুষেরা যে একই রকম সুখ দুঃখে বিষণ্ন বা উল্লসিত হয় না, তা এই মূর্খ গাড়োয়ান জানবে কি করে। জানবে কি করে একটা সামান্য কথার খোঁচা কতোটা এফোঁড় ওফোঁড় করে দিতে পারে কোনো কোনো নিরীহ, নির্বিরোধ, সন্তর্পণে বেঁচে থাকা স্বপ্নদর্শী মানুষের বুক, কিভাবে খেলাচ্ছলে খুন করে তাদের মূল্যবোধ। কাঞ্চনেরা অনুভব করে, এ গল্পের পাঠকের সঙ্গে সঙ্গেই অনুভব করে, মজ্জাগত স্থূলতায় ভরে গেছে শহরের দেহমন। হিংস্র অভব্যতা চারিদিকে। মজ্জাগত ধর্ষকাম, মানুষের। না হলে এমন জঘন্য ইঙ্গিত সত্যি কি পাওনা ছিল কাঞ্চনদের? যে নিভৃত মুহূর্তে তারা তাদের ফেলে আসা দিনগুলির দিনগত পাপক্ষয়ের হিসেব মেলাতে ব্যস্ত ছিল, ব্যস্ত ছিল চাওয়া পাওয়া না পাওয়ার দরিয়ায় ডুবে সেই পাপস্খালনে, অন্তত কিছুক্ষণের জন্য, তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের সমবেত ব্যর্থতাকে ভুলে নিজেদের মধ্যে একটু খুশি, একটু আনন্দ বাঁটোয়ারা করে নিতে—সেই মুহূর্তটুকু-কে চোখের সামনে নষ্ট হয়ে যেতে দেখলো তারা, এমন অপ্রত্যাশিত আঘাতে চূর্ণ হতে দেখলো। হয়তো বুঝলো, হয়তো বুঝলো না, যে ভদ্রলোক, ভালোমানুষ, প্রখর অনুভূতিপরায়ণের জন্য পৃথিবীটা নেই আর, কর্কশ স্থূলতার রোমহর্ষে বেপথুমান হয়ে গেছে সমস্ত সংবেদনশীলতা! মানুষকে অনায়াসে ভুল বোঝা, মনগড়া ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে মানুষকে দেগে দেওয়া এই সময়ের এক ইতর অভ্যেস। "মালাটা হাত থেকে রাস্তায় পড়ে গেল"—আবার! ওদের চোখের কোণে তখন ফোঁটা ফোঁটা নোনতা সেন্টিমেন্ট, স্বপ্নভঙ্গ। আঁধার ঘনিয়ে আসা এ শহরে ওরা যেন একেবারে অপরিচিত, আউটসাইডার। রেখা আর কাঞ্চন। ওদের চোখের সামনে ঘোড়াটা ছুটছে। অশ্বমেধের ঘোড়া। "সত্য যে, দিগ্বিজয়ী অশ্বের শোণিতে যজ্ঞের আহুতি পূর্ণ হয়!" সেই যজ্ঞের আহুতি শুধু একালে যোগ্যের আহুতিতে বদলে গেছে। তুমি অতিরিক্ত সেনসেটিভ হবে, আর তার শাস্তি পাবে না, তা কি হয়? সবকিছুর একটা সমাজমান্য মাপ আছে, জানো না?

দুই

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অশ্বমেধের ঘোড়া' গল্পটির আধুনিকতা নির্ভর করে আছে অনেকখানি তার কথনভঙ্গির অনন্য স্বভাবে। আখ্যান-অংশটি সামান্য। কিন্তু সেই সামান্য আখ্যানকে অসামান্য মুন্সিয়ানায় চেতনা-অবচেতনে জুড়ে, সময়ের সরলরৈখিক চলনকে দুমড়ে মুচড়ে নিয়ে এখানে পাত্রপাত্রীর একদিন প্রতিদিনকে চিরদিনের বৌদ্ধিক উচ্চতা ও

আদল দেওয়া হয়েছে। আখ্যানের চরিত্রও স্থির নয়, কেন্দ্রীয় অনুভবটি বারবার বদলে বদলে গেছে, প্রথম পুরুষ থেকে উত্তমপুরুষে। অর্থাৎ গল্পের বয়ান কোথাও লেখকের, কোথাও বা নায়ক কাঞ্চনের এবং এই দ্বিমাত্রিক ন্যারেটিভের কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে স্থান বদল ঘটেছে। সতর্ক পাঠকের অনুভবে লেখকের সঙ্গে কাঞ্চনের এমন একাকার অস্তিত্ব ক্ষেত্রবিশেষে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে। একটানা কাহিনিবুননের অপেক্ষাকৃত নিরাপদ পথ ছেড়ে দীপেন্দ্রনাথ কখনো ঘটনার মধ্যে থেকে আবার কখনো ঘটনার বাইরে নৈর্ব্যক্তিক ব্যবধানে দাঁড়িয়ে অনুভূতিশীল মানুষের অসহায়তায় গল্প লিখেছেন। যে গল্পের মেজাজ লিরিক্যাল, কিন্তু পরিণতিতে আছে গদ্যের কড়া হাতুড়ির প্রচণ্ড ধাক্কা।

কাঞ্চন বা রেখা যে সব কারণে দুঃখ পায়, তা হয়তো গড়পড়তা বাঙালি মধ্যবিত্তের চেনা দুঃখ নয়, তারা যাতে আনন্দ পায় তা-ও হয়তো সকলের জন্য নয়। তবু তো হাইপার সেনসেটিভ এমন বিরল কিছু মানুষ থাকেই। তাদের পৃথিবী ও পরিপার্শ্বের সঙ্গে মিথষ্ক্রিয়ার ধরনটাও আর সকলের মতন হবার নয়। এই গল্পের কাঞ্চন এবং রেখার জীবন যাপন, প্রাপ্তি ও প্রক্ষোভ, তাদের প্রবণতা এবং প্রশমন এই কারণেই জটিলতর বিন্যাসে গড়া। তারা সাধারণতন্ত্রের মধ্যে দাঁড়িয়েও বৈশিষ্ট্যে 'বিশেষ'। নিয়মিত জীবনপ্রবাহে ভাসমান ব্যতিক্রমী প্রাণকণা। 'অশ্বমেধের ঘোড়া' এই সব দলছুট্ মানুষের বিপন্নতার, বিষণ্ণতার কথকতা। এমন আততায়ী সময়ের মহাট্র্যাজেডি।

'অশ্বমেধের ঘোড়া' গল্পের নানা দুরন্ত বাঁকে কিছু আশ্চর্য প্রতীকের প্রয়োগ দ্যাখা গেছে। যেমন এখানে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ঘুরে ফিরে এসেছে সানাইয়ের চন্দ্রকোশ। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে এমন সুরের আবহ, ক্ষেত্রবিশেষে অন্তত, বাস্তবে নেই বোধহয়, সুর শুধু বাজছে কাঞ্চনের কল্পনায়। চারদিকের বেসুরো বেতালা বেঁচে থাকাকে পাশ কাটিয়ে, অর্থহীন নানা শব্দবমনের মাঝে কাঞ্চন, শুধু কাঞ্চনই খুঁজে নিতে পারে যে সুরেলা স্বর। সানাইয়ের বিষণ্ণমধুর মিশ্র সুরতরঙ্গের অনুষঙ্গে এই গল্পের স্মৃতি ও সময় একবছরের বিস্তৃত প্রেক্ষিতে মথিত হয়েছে—বিয়ে থেকে বিবাহবার্ষিকী।

পুরাণ এবং পরম্পরা সাক্ষী, অশ্বমেধের ঘোড়ারা কখনও নিজের জন্য যুদ্ধ করেনি, করার কথাও নয়, অথচ তারা যুদ্ধজয়ের পতাকা বহন করেছে, হয়ে উঠেছে বীরত্বের চিহ্নিত প্রতীক, বিজয়ের নিরঙ্কুশ আইকন। তারপর নানা নিষিদ্ধ কলাকুশলী যৌনাচারের শেষে, তাদের হত্যা করে আর্য সম্রাটেরা হয়েছেন রাজচক্রবর্তী। বলাবাহুল্য, ইতিহাসের অন্ধকার আস্তাবলেও ঠাঁই হয়নি সেইসব হতভাগ্য চারপেয়েদের। অনেকগুলো টুকরো এক্সপ্লয়টেশনে এভাবে পূর্ণ হয়েছে কতিপয়ের অ্যামবিশান, ঠিক যেমন আধুনিক সভ্য সমাজের মুখ বারবার ঢেকে গেছে তথাকথিত শিষ্টতার বিজ্ঞাপনে। নানা হিতাকাঙ্ক্ষী উপদেশে উপদেশে গুরুকুল ও প্রতিষ্ঠান বরাবর চেয়েছে জনসাধারণ হয়ে উঠুক সহজ সরল, অনুগত এবং দায়বদ্ধ। কিন্তু প্রথাগত, ঘোষিত সুসমাচারের বাইরে, বাস্তবে, দ্যাখা গেছে বিপরীত রঙ্গ, যাদের নাকি আদর্শ হওয়ার কথা, তারাই হয়ে উঠলো চাঁদমারি, তেমন মানুষদেরই মনে মনে মেরে দিল এই বর্তমান, প্রতিদিন পুঁতে দিল ষড়যন্ত্রী নিন্দার পাঁকে। দ্যাখা গেল, বাস্তবে সরলতার অন্তর্ধানপটে প্রতিদিন লেখা হচ্ছে সফলতার সাম্প্রতিক ব্যালাড! অর্থাৎ আর এক ধরনের

সূক্ষ্মতর এক্সপ্লয়টেশন, ক্ষমতার অলিন্দ থেকে যা অহরহ ছুঁড়ে দেওয়া হচ্ছে একালেও, আর এক ধরনের বর্বরতা, বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ভিন্ন নামে। ভিন্ন পরিচয়ে, ভিন্নতর পরিভাষায়। সুতরাং সরাসরি বলা না হলেও একটু ভেবে দেখলে বোঝা যায়, এই বিশেষ গল্পে গল্পকার কেন এবং কীভাবে সেই রণজয় আর হননবৃত্তান্তকে এখানে শিল্পের প্রত্যহে, নামকরণের মধ্যে, উচিত প্রতীকী মূল্যে গ্রহণ করেছেন। কেন এবং কীভাবে একালের কাঞ্চনেরা সেই অস্বস্তিকর প্রতারক পরম্পরায় অসচেতনভাবে লগ্ন হয়ে যায়!

গল্পে সত্যি পৌরাণিক 'অশ্বমেধ' যজ্ঞ নেই, যজ্ঞাশ্বও নেই। তবু একটা ঘোড়া আছে। তাকে কেন্দ্র করে আছে সেই আবহমানের চলচ্ছবি। রেখা আর কাঞ্চন ঘোড়াগাড়ির ছোট্ট পরিসরের বাধ্যত প্রাপ্ত চলমান নিরালায় যেন নিরীক্ষণ করেছে সেই ইতিহাসের উত্তরাধিকার, মনে মনে, এক বিপরীত বিশ্বের ব্যাহত সময়ে, আকাঙ্ক্ষার অপচয়ের মাঝে :

> "অশ্বমেধ যজ্ঞের গর্বিত ঘোড়াটি ঘাড় বেঁকিয়ে আগুনের নিঃশ্বাস ফেলে চলে গেল। আর দ্রাবিড় কন্যা আর্য ঘোড়াসওয়ারের পায়ের তলায় হাহা করে কেঁদে উঠলো। তারপর চেঙ্গিজ খাঁ অশ্বারোহী দল শেকল বেঁধে দাসদের টেনে নিল। তারপর লরেন্স ফস্টর ধুলো উড়িয়ে দিল্লিতে পতাকা ওড়াল। আর পতাকার রঙ পালটায়। স্বর্গের উচ্চৈঃশ্রবা এমন ধর্মনিরপেক্ষ কলকাতার মাঝে পাটোয়ারি বুদ্ধিতে বাজি দৌড়ায়। আর যে যজ্ঞের অশ্বকে ফিরিয়ে আনতে ভগীরথ মর্ত্যে গঙ্গা এনেছিল, মাত্র আড়াইটাকার বিনিময়ে সে আমাদের খিদিরপুর পৌঁছে দেবে।"

পুরনো যুদ্ধ, যৌনতা আর দিগ্বিজয়ের ধরনটা বেসাতির এই বেশরম সময়ে বদলে গিয়ে যে গৌরবহীন ভোঁতামির নামান্তর হয়ে যাবে, তাতে আর সন্দেহ কী। বরং এই পরিবর্তনের মধ্যে ঐতিহাসিক অনিবার্যতাই কিছু রয়ে গেছে।

আরও বেশ কিছু বিশিষ্টতায় উজ্জ্বল নানা প্রতীকের বুদ্ধিদীপ্ত ব্যবহার এই গল্পে চোখে পড়েছে। যেমন ভেঙে পড়া সেনেট হল যেন নব্যনাগরিক বাঙালির ঐতিহ্য হারানো আর পতনশীল বোধের প্রতীক, যেখানে সৌন্দর্যের বদলে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে আটপৌরে প্রয়োজনের মোটা দাগকে। বিবাহচিহ্ন মালাটিকে বলদের খাদ্য বানানোর নির্মম ছবিতেও আছে নির্বোধ স্থূলতার ভয়ঙ্কর সংকেত। ফিটনের খোপে অপ্রকাশ্য ঘনিষ্ঠতায় কাঞ্চনের শারীরিক উত্তেজনার অসামান্য চিত্ররূপ, "আমার এই শরীর গীর্জার উজ্জ্বল মোমবাতি, বিন্দু বিন্দু ঘাম ঝরে পড়ছে"—দ্যোতনাময় এই প্রকাশভঙ্গিমা যৌনতার শরীরী আবেশকে অনবদ্যতায় বদলে দিয়েছে। গল্পের আরও একাধিক অংশের দৃষ্টান্ত পেশ করে দ্যাখানো যায়, শব্দে শব্দে ছবি আঁকা দীপেন্দ্রনাথের প্রিয় অভ্যেস। এবং এইসব চিত্রকল্পের মধ্যে পরিবেশ পরিস্থিতির সঙ্গে চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক সংশ্লেষ নির্ভুল জটিলতায় মিশ্রিত হয়েছে।

এই গল্প প্রধানত কাঞ্চনের। তার আবেগ, আবেদন এবং অবদমনের। হীনম্মন্যতা আর হীন নাগরিক তামাসার বাইরে নিজস্ব নিরালম্ব অবস্থিতির, আততি ও উচ্ছ্বাসের। রেখার প্রতি তার মনোযোগের, এমনকি অমনোযোগের, ভালোবাসাময় অধিকারবোধের, ছেলেমানুষির আবার ব্যর্থকাম হতাশার। অতিমাত্রায় সংবেদনশীল হবার জন্যই একটু বেশি এক্সপ্রেসিভ সে। মুহূর্তে মুহূর্তে তার আবেগের রঙ বদলায়। কখনো সানাইয়ের সুর শুনে "চমকে" ওঠে

তো কখনো রেখার মন্তব্যে "হা হা করে হেসে" ওঠে। পরক্ষণেই "লজ্জা" পায়, আবার প্রায় পরে পরেই রেখার সাহস দেখে "স্তম্ভিত" হয়। তার সমস্ত মানবিক আবেগগুলিই সৎ, শুধু সংবেদনশীলতা সৃষ্টিছাড়া। হিংস্র-অসুন্দর এক কেজো জগতে সে বেমানানরকম মৃদু ও ম্রিয়মাণ, অনুকম্পায়ী, অতএব ক্ষণে ক্ষণে আক্রান্ত, সন্ত্রস্ত এবং রক্তাক্ত। তবু জীবনকে, জীবনের পেলব নান্দনিকতাকে সে ভালোবাসে। তাই জীবন থেকে পালানোর কথা ভাবতেও পারে না। একধরনের মৌলিক দায়িত্ববোধ তার ভাবনাকে নিয়ন্ত্রণ করে। ভারসাম্যে ভরে রাখে। রেখাকে সে তীব্রভাবে ভালোবাসে। রেখাকে ভালোবাসাই তার জীবনকে ভালোবাসা। গোটা গল্পে রেখার ভূমিকা কিছুটা গৌণ। তার ইচ্ছা অনিচ্ছাগুলি সে অনেকটাই যেন কাঞ্চনের ইচ্ছা অনিচ্ছার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছে। তার ব্যক্তিত্বের অভাব নেই, তার অনুভূতি ও পছন্দগুলিও বৈশিষ্ট্যময়। সে স্বার্থপর নয়, সে জানে সে এমন কাউকে ভালোবাসে, যে মানুষটা একটু আলাদা, জটিল ধরণের, বিশেষভাবে অন্তর্মুখী। রেখা তার কথা আর কাজের মধ্যে কাঞ্চনকে নানাভাবে সমর্থন যোগায়। সে বোঝে, তার অস্তিত্ব কাঞ্চনের কাছে কতোটা দামি। তার ভালোবাসা ছাড়া, সে বোঝে, কাঞ্চনের অস্তিত্ব কতোটা বিপন্ন হয়ে যাবে। তাই এই ভালোবাসা রেখাকে অহংকারী করে, একজনের জীবনে তার ভূমিকা এবং তাৎপর্য এতোখানি, বোঝার অহংকার। কেতাবি নারীবাদ যে অহংকারকে কখনো বুঝবে না।

একটা নাছোড় খটকা তবু ভিতরে ভিতরে অস্বস্তি আনে। আচ্ছা, আমরা, মানে মধ্যবিত্ত পাঠকেরা, মধ্যবিত্ত কাঞ্চন ও রেখার পক্ষে দাঁড়িয়ে গল্পটাকে পড়ছি বলে একধরনের ভুল পক্ষপাতে ঘোড়াগাড়ির ঐ গাড়োয়ানকে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি ভিলেন বানাচ্ছি না তো? লোকটার কাছে আমরা যে ভাষারুচি, যে ব্যবহার আশা করছি, তা আমাদেরই মধ্যবিত্ত সুলভ 'আদর্শ' ব্যবহারের বানিয়ে তোলা প্রত্যাশা নয় তো? কোনও সন্দেহ নেই, লোকটা ভোঁতা, ভালগার। হ্যাঁ, সে অসৎ, অপারচুনিস্টও। কিন্তু তার শ্রেণি-স্বভাবের পক্ষে তার এই আচরণ এতোই স্বাভাবিক, যে, তাই নিয়ে বাড়াবাড়ি রকম হা হুতাশ করাটাই অতিকল্পনা বলে মনে হতে পারে। আচ্ছা, কোন্‌টা বেশি আঘাত করেছে কাঞ্চনদের—অন্যায়ভাবে বাড়তি টাকা চাওয়া, নাকি 'ফুর্তি' জনিত যৌন ইঙ্গিত? মধ্যবিত্ত তো দীপেন্দ্রনাথ নিজেও, তবু তাঁর মার্কসবাদী মন ও মনন নিশ্চয় স্বীকার করবে, গাড়ি, শ্রম এবং 'সুযোগে'র বিক্রেতা হিসেবে মওকা বুঝে চাপ দিয়ে এই 'বাবু'-দের (কাঞ্চনকে এই সম্বোধন সে গল্পে বারবার করেছে) থেকে বাড়তি দুপয়সা কামিয়ে নেওয়াটা এই গাড়োয়ানের পক্ষে অন্যায় হতে পারে, কিন্তু অসম্ভব নয়। কার্যত তার অশালীন উচ্চারণের মধ্যে ভিতু, হিপোক্রিট, পেটে খিদে মুখে লাজ এই বাবুশ্রেণির প্রতি আগে থেকে স্থির, পূর্ব অভিজ্ঞতার নিরিখে নির্ধারিত একরকম ফিচেল বদমায়েশি-ধারণারই প্রকাশ ঘটেছে। "ফুর্তি করবেন, হোটেল ভাড়াভি দিবেন না"—বলাটা তাই মধ্যবিত্ত পাঠকের কাছে, মধ্যবিত্ত লেখকের কাছে, এমনকি মধ্যবিত্ত নায়ক-নায়িকার কাছে যতোটা অশালীন, অতএব শকিং—স্বয়ং বক্তার কাছে কিন্তু আদৌ তেমন নয়। তার পূর্ব অভিজ্ঞতা তাকে জানিয়েছিল, এমন ক্ষেত্রে বাবুরা একটু আধটু ফস্টিনস্টি কোরে থাকে, তাই সে ঘটনাচক্রে দাঁও মারতে চেয়েছে, সত্যি বলতে কি, আঘাত করতে চায়নি, করবে কেন, খদ্দেরকে কেউ চটায়? আসলে শালীনতার সংজ্ঞাও তো

শিক্ষিত ভদ্রসাধারণ নিজেদের মতো করে নিজেরা তৈরি করে নিয়েছে। কোনও সন্দেহ নেই, ঝোপ বুঝে কোপ মারা, খুচরো ব্ল্যাকমেল এবং অশালীন ইঙ্গিত খুব অন্যায়। কিন্তু শিক্ষিত অধ্যাপকের ন্যায়বোধ আর প্রান্তিক সহিসের ন্যায়বোধকে কবেই বা এক মানদণ্ডে বিচার করা হয়েছে? শ্রেণিবিভক্ত সমাজ জানিয়েছে, 'ওরা' আর 'আমরা' এক নই, কারণটা সহজে অনুমেয়। তাদের সমস্যা, সমাজ, বেঁচে থাকার ব্যাকরণ, আর্থসামাজিক পরিকাঠামো—কোন্‌টা একরকম? ন্যায় অন্যায়ের ধারণা তো জীবনযাপনের এই সমগ্র থেকেই উঠে আসে। তাই 'ওদের' আচরণ আর 'আমাদের' আচরণের মধ্যে পার্থক্য থাকে। তাছাড়া আমরাও কি প্রতিটি ব্যক্তিমানুষের আলাদা হয়ে ওঠা, আলাদা দুঃখ সুখের বোধ, আলাদা প্রতিক্রিয়াকে সব সময় সততার সঙ্গে স্বীকার করি? একই রকম পরিস্থিতিতে দশজন মানুষ যে সত্যি সত্যি দশটা আলাদা রকম আচরণ করতে পারে—এই মৌলিক সত্যে আমরা নিজেরাই কি যথেষ্ট বিশ্বাস রাখি? আমরা, শিক্ষিত ভদ্রলোকেরাও কি প্রতিটি পৃথকের মূল্য না বুঝে, তারতম্য না বুঝে, মেরে দিই না সবকিছুতে গড়পড়তা সাধারণীকরণের মোটা মার্কা? কাঞ্চনেরা যে সুভদ্র, আলাদা ধরনের মানুষ—গাড়োয়ান তা বোঝে নি। কিন্তু অন্যেরা কি তা বুঝেছে? না হলে সারা বছর এভাবে তাদের পালিয়ে বেড়াতে হয় কেন? কিসের ভয়ে? কাদের ভয়ে? আসলে কারণ তো একটাই, তারা বড্ড বেশি ভালো, বড্ড আলাদা। কারণ তারা নিয়ম নয়, ব্যতিক্রম। নিয়মের দুনিয়া তাই তাদের আঘাত করে। ক্রমাগত আঘাত করেই চলে। কিন্তু তবু সব জেনে-শুনে-বুঝেও পাঠক রেখা আর কাঞ্চনের পাশে এসে দাঁড়ায়। তাদের সঙ্গে একাকার আইডেনটিটি, অনুভব খুঁজে পায়। অনুভব করে, এই যন্ত্রণা এই অপমান তাদের কখনো প্রাপ্য ছিল না। এটা আর যাই হোক্ জাস্টিস নয়।

এবং সেই কারণেই হয়তো কিছু প্রশ্ন থেকে যায়। কাঞ্চন আর রেখার মতো দুজনকে তবু কেন শুনতে হবে "ফুর্তি করবেন, হোটেলভাড়াভি দিবেন না?" তবে কি এই ধরনের অশ্লীল মন্তব্য, কু-ইঙ্গিত, সন্দেহ আর সুযোগসন্ধানই প্রচলিত রীতি বলে? সংখ্যাগরিষ্ঠের অনুতাপহীন জীবনাচার বলে? কিছু কিছু তাপ-উত্তাপশূন্য মানুষ—কী আশ্চর্য—বুঝতেই পারে না, তাদের আচরণ বিচরণ উচ্চারণ আর একজন মানুষের গভীরে কতোটা রক্তপাত ঘটায়। সামান্যতম সহমর্মিতাও কেমন সব দিক থেকে হারিয়ে গেছে যেন। অবশ্য নির্বোধরা কবেই বা নিজেদের নির্বোধ বলে চিনেছে। যেমন কাঞ্চনের তথাকথিত 'বন্ধু' সুবিমল রেখার দিকে তাকিয়ে, সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলে "আপনার বোন?

না।

ছাত্রী?

না।

ও বুঝেছি। সুবিমল মুখটা উজ্জ্বল করে বলল, 'দেখেও আনন্দ।"

কেন এত অপবিত্র কৌতূহল? একজন প্রাপ্তবয়স্কের ব্যক্তিগত এলাকাকে আর একজন প্রাপ্তবয়স্ক কেন সম্মান করবে না? যথাবিহিত মান্যতা দেবে না? তা হলে এ কেমন শিষ্ট সমাজ, এ কেমন শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সদাচার, সহবত? এ কেমন প্রগতি তবে? এ কোন্ অশ্বমেধের ঘোড়া? এ কিসের দিগ্বিজয়?

যেন কাচের পৃথিবীর পিচ্ছিল পাটাতনে দাঁড়িয়ে একজন কাঞ্চন ভাবছিল এই সব। একজন রেখা দেখছিল ত্রিমাত্রিক জ্যামিতির এই জগৎকে। মানুষ গড়তে গড়তে ভাঙছে, আবার ভাঙতে ভাঙছে গড়ছে। তারা দেখছিল এই ঘুরপাক, এই পাল্লাদৌড়, এই ঘরবারান্দা দরদালানে মিলিয়ে বাঁচার নানা কসরত। যার শেষ অভিমুখ তবু তো সেই মানুষ। সেই মানুষ, যে উদাসীন, প্রশান্ত, আবার যে আগ্রাসী, জাঁহাবাজ। যে জীবনের রাজপথে পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা হাসিল করে কৃতার্থ, হিসেবি, চৌখস, চাকচিক্যময়। পরম বিজয়ী। আবার যে চরম পরাজিত। সোনালি সফলতার সহজপাঠ যে জীবনেও পড়েনি, পড়তে চায়নি। ইঁদুরদৌড়ের পৃথুল হ্যাংলামির থেকে ঢের দূরে থেকেছে। যে একেবারে হেরে হেরে ভূত, জীবনের সরাইখানায় ভুল নেশায় চুর, ফতুর—হাসতে হাসতে কপর্দকশূন্য—এদের সব্বাইকে নিয়ে, এদের সবাইয়ের জন্যই দীপেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'অশ্বমেধের ঘোড়া'। সময়টা ছিল ষাট-সত্তরের গোধূলিসন্ধি, নতুন মিলেনিয়াম তখনও ঢের দূরে।

আর এখন, আমরা দেখছি বিশ্বায়ন, বিন লাদেন, বাজার অর্থনীতি, আর বেবাক বুদ্ধিজীবীদের উত্তর-আধুনিক তত্ত্বতামাসা। বুঝেছি, "অপরে পাওনা আদায় করেছে আগে/ আমাদের পরে দেনা শোধবার ভার।" ভাবছি, সমস্ত কাঞ্চন কি কাচ হয়ে গেল তবে? কোনো রেখাই কি তবে সরল নয়? শেষ পর্যন্ত তারা সবাই কি সময়ের কারসাজিতে বৃত্তাকার শূন্যে হারিয়ে যায়?